প্রস্তাবনা

।। ১ ।।

'ট্র্যাজেডি' কথাটি জীবনে ও সাহিত্যে প্রায়শঃ ব্যাপক ও শিথিল অর্থে ব্যবহার করবার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। জীবনের যে কোন দুঃখময় অভিজ্ঞতাকে, বিড়ম্বনাকে ট্র্যাজিক বলা হয়, তার শিল্পরূপায়ণকে বলা হয় ট্র্যাজেডি। কিন্তু একটু সজাগ হলে বুঝতে পারি যে, দুঃখময় অভিজ্ঞতা, বিড়ম্বনা ট্র্যাজেডির স্থূল উপকরণ বটে, কিন্তু তার রূপায়ণ মাত্রেই ট্র্যাজেডি নয়। সাধারণ দুঃখের কাহিনী এবং ট্র্যাজিক দুঃখের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে - পার্থক্য রয়েছে শৈল্পিক রূপায়ণেও। দুঃখময় অভিজ্ঞতা [illegible] এবং ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতা সমার্থক নয়, - দুঃখান্ত - পরিণামী কাহিনী মাত্রেই ট্র্যাজিক নয়। এই কথা না মেনে উপায় নেই যে, দৃষ্টিকোণের হেরফেরের জন্য একই দৃষ্টবস্তুর আবেদন বদলে যায়। একই বস্তুর সম্পর্কে একাধিক অভিজ্ঞতা সম্ভব দ্রষ্টা ও দৃষ্ট বস্তুর পারস্পরিক অবস্থানগত সম্পর্কের জন্য। মানবজীবনের দুঃখক্লেশ, দৈব বিড়ম্বনাকে শিল্পী কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন, কোন্ ভঙ্গীতে গ্রহণ করছেন, তার স্বরূপ কি তার উপরে নির্ভর করে বিষয়টি ট্র্যাজিক কি না। যেমন ধরা যাক, প্রাচীন হিব্রু কাহিনীর জোব (Job) বিপুল দুঃখকষ্ট ভোগের শেষে যে উপলব্ধিতে পৌঁছলেন তা হল এই যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রশ্নাতীত, তাঁর বিধানে অযথা বলে কিছু নেই, - ঈশ্বরের বিচার সব সময় যথাযথ এবং ন্যায়ানুগ। [১] কীড্ (Kyd) রচিত "The Spanish Tragedy" নাটকের শেষে ঐ আশ্বাস পাওয়া গেল যে, দুঃখান্ত নায়কের জন্যে রয়েছে স্বর্গের প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর বিরোধীদের জন্যে অপেক্ষমান নরকের যন্ত্রণা। [২] নায়কের জন্যে ভবিষ্যৎ সুখের প্রতিশ্রুতি সবসময়ই ট্র্যাজিক নয়। আবার ভারতীয় ক্লাসিক নাটকে লক্ষ করি কবিদের প্রগতিক নিরীক্ষা ভিন্নজাতের। দুঃখক্লেশ উপেক্ষিত নয় - তার তাৎপর্য ভিন্নতর। জ্বালা যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে নায়কের উত্তরণ ঘটে প্রশান্তিতে। এখানে সুখ দুঃখ, হর্ষবিষাদ সব কিছুকে অতিক্রম করে শান্তের অধিষ্ঠান। দুঃখকে বাদ দিয়ে নয়, তাকে স্বীকার করে নিয়েই সেখানে পৌঁছতে হয়। জীবনে দুঃখ জ্বালা ভোগ জীবনের পূর্ণতা উপলব্ধির অঙ্গ মাত্র। জগতের অমোঘ নিয়ম মেনেই সমে ঝড়ঝঞ্ঝা, ধরা-প্লাবন আবার এই নিয়মের অধীনে ফোটে ফুল। মানুষের জীবনেও তাই। এই

সমগ্র দৃষ্টিতে বিধৃত জীবনদর্শন ট্র্যাজেডির পরিপন্থী । ~~এরিস্টটলের~~ যে এহেন দৃষ্টিতে দুঃখের তাৎপর্য বদলে যায় - বলা সঙ্গত, তা আনন্দের পরিপোষণা করে । ভারতীয় নাটক তারই সাদৃশ্যিক রূপ । [৩] মোটের উপর বলা যায় সুখদুঃখ, হর্ষবিষাদ, ভালমন্দ, জীবন-মৃত্যু সব মিলে যে পরিপূর্ণতা ভারতীয় কবি তাকেই শিল্পায়িত করেছেন । এই বিষয়ে উদাহরণ আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে । [৪] নগ্ন কবি বেদনার ভিতর দিয়ে বেদনার উত্তরণ ঘটে যাচ্ছে । আঘাতে আঘাতে মানুষটির ঘটে যাচ্ছে - রূপান্তর । আসলে দুঃখপরিণামী নাটকে অথবা দুঃখোত্তরজনক নাটকে যেখানে দুঃখের সান্ত্বনা আছে, জীবনের জ্বালা - যন্ত্রণা যেখানে শেষ নয়, বা আঘাতে দুঃখভোগের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে এমন ভাব ব্যঞ্জিত হয় সেখানে ট্র্যাজিক সংবিদ সৃষ্ট হতে পারে না । এমন কি যেখানে দৈব বিড়ম্বনা ভোগ, দুঃখক্লেশভোগ সাময়িক, যার মূলে কোন অন্ধ সামাজিক প্রথানুগত্য, কোনো ধর্মীয় প্রথাসক্ততা থাকে সেখানেও ট্র্যাজেডি সম্ভব নয় । কারণ দুঃখভোগের হেতু যখনই জানা গেল তার নিরাকরণের পথও জানা গেল, তখন সংকট অনুত্তরণীয় নয় - তার সমাধান সম্ভব । এহেন মাইনর নাটক প্যাথেটিক হতে পারে - কিন্তু ট্র্যাজিক নয় । কেননা মার্কসীয় সমাজ বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মুনাফাকে কেন্দ্র করে মুষ্টিমেয় ভোগী সম্প্রদায় জন্মে জন্মে বৃহত্তর জন-জীবনকে শোষণ করছে । ধনবণ্টনের বৈষম্যের ফলে মানুষ ভোগ করছে চরম বিড়ম্বনা । এই বিষয়ে সজাগ মানুষ যখন বিদ্রোহ করে শোষণহীন সুস্থ সমাজ গঠনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে মৃত্যুবরণ করে, তখন আর তা ট্র্যাজিক নয় । [৫]

পক্ষান্তরে ট্র্যাজেডিতে নগ্ন করি সান্ত্বনাহীন দুঃখভোগ, চরম পরিণামে কেবল অন্ধকার, - গাঢ় অন্ধকার । ~~ট্র্যাজিক~~ ট্র্যাজিক নায়কের জন্যে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোনো সান্ত্বনা নেই । পাপপুণ্যের নিক্তিতে কোনো বিচার চলে না । অনুশোচনার ভিতর দিয়ে আত্মোদ্ধারের কোনো পথ খোলা থাকে না । ইডিপাস, প্রমিথিউস, লীয়র, ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেটের সংকট অনতিক্রম্য - তাঁদের সামনে মুক্তির কোনো পথ খোলা নেই । তাঁদের দুঃখভোগকে কোনোভাবে একটিন লঘু করা যায় না । তাঁদের দুর্ভোগের কোনো উত্তর নেই । ডঃ ফস্টাসের নেই কোনো সান্ত্বনা - তাঁদের কারুর

অন্য অপেক্ষা করে না সুন্দর প্রতিশ্রুতি - যা ঐক্যতানের মধ্যে কেউ উপলব্ধি করেন না ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়। ট্র্যাজেডির ক্ষয়ক্ষতি অপূরণীয়। কোনো কিছুর বিনিময়ে দুঃখ-যন্ত্রণা যা ঐশী এতটুকু সহ্য করা যায় না। [৭] তাঁদের কাহিনীতে আমরা দেখি কোনো মর্মন্তুদ ঘটনার শিল্পিত রূপ। যা আমাদের আলোড়িত করে অনুকম্পায় আসে, চলে ঘটে যায় আবেগের শুদ্ধি উৎসারণ। আর ট্র্যাজেডি কোনো প্রাণপ্রবল মানুষের বলিষ্ঠ বাসনার কামনা-বাসনার মর্মান্তিক ব্যর্থতার কাহিনী হলেও তা জীবনের অনির্বাণতায় আশাবাদী। দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করবার ভিতর দিয়ে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখা যায় তার মধ্যে দিয়ে মানুষের অপরাজেয় মহিমা ব্যঞ্জিত হয়। নষ্ট করি পরাজয়ের করুণতম মুহূর্তে মানুষের উজ্জ্বলতম, ধ্বংসোন্মুখ মৃত্যু অবসানের মুহূর্তেও দীপ্ত, কখনো বা দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতায় মহৎ। এই কারণে ভীতি ও করুণার যুগপৎ উদ্দীপনের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর আত্মপ্রসাদ অনুভূত হয়। সাধারণ দুঃখের কাহিনীর আবেদন এবং ট্র্যাজেডির আবেদনের মধ্যে এইখানে মূল তফাৎ করুণরসেরও। [৮]

।। ২ ।।

আমরা বাংলা ট্র্যাজেডি নাটকের বিচার-বিশ্লেষণে নায়কের দুঃখভোগের স্বরূপের উপর দৃষ্টি রেখে নাটকটি ট্র্যাজেডি কি না স্থির করেছি। নিরুপায় দুঃখভোগের মর্মন্তুদ শিল্পরূপায়ণকে বলেছি ট্র্যাজেডি। দুঃখপরিণামী নাটকের বিশিষ্ট ধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য চিত্তপ্রকর্ষ ও দ্রবীভূত হৃদয় মানসিক বৃত্তিকে ট্র্যাজিক সংবিদ্ বলা হয়েছে এবং ঐ সংবিদ্ সৃষ্টির বিশিষ্ট পদ্ধতিকে করণকৌশল বলে অভিহিত করা হয়েছে। লক্ষ্য করতে চেষ্টা করেছি, উপাদান-উপকরণের রূপায়ণ এমন হয়েছে কিনা যাতে কর্মরত নায়ক, পরিবেশ - পরিস্থিতি, আকস্মিক যোগাযোগ সব কিছু ওতপ্রোত হয়ে কাহিনীকে, নায়ককে যে পরিণতির দিকে ঠেলে দিল তার মধ্যে অযোগ্যতার ভাব ফুটেছে কি না, করুণা ও ভীতির উদ্দীপনের সঙ্গে সঙ্গে মানবমহিমা ব্যঞ্জিত করে কি না।

আমাদের আলোচনার কালসীমা জি.সি.গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ট্র্যাজেডি নাটক। ঐতিহাসিক কারণে এবং কিছুটা সাহিত্যিক কারণেও বটে "কীর্তিবিলাস" ও

"বিধবা বিবাহ" নাটক আলোচিত হয়েছে। তার যেহেতু ইতিহাস রচনা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় তাই তার পর থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি নাটক আলোচিত হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে ট্র্যাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তন অনুসৃত হয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়তে পারে বিবর্তন এই রকম, গি.গি.গুপ্ত এবং উপেন্দ্রনাথ মিত্র মৃত্যু - পরিণামী নাটককে ট্র্যাজেডি বলে মনে করেছেন। মৃত্যু মাত্রেই যে ট্র্যাজিক নয় এমন ধারণা তাঁদের ছিল বলে মনে হয় না। মধুসূদনে এসে ধারণা স্পষ্ট হল কিন্তু নাটকীয় চরিত্র - কল্পনার দুর্বলতার জন্য ট্র্যাজেডি সার্থক হল না। আরো লক্ষণীয়, তিনি গ্রীক ট্র্যাজেডি কল্পনাকে সেক্সপীরীয় ছাঁদে বিন্যস্ত করেছেন। স্বাদেশিকতা উদ্বোধনের মাধ্যমরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' 'সরোজিনী' 'অশ্রুমতীর' ইত্যাদি নাটক দেখা দিয়েছিল। এসব নাটকে নাটকে দুঃখ ও যন্ত্রণাভোগ ব্যক্তির তথা জাতীয় না হয়ে যদি ব্যক্তির জীবনে অনপনেয়রূপে দেখা দিত, তাহলে গুলো ট্র্যাজেডি হয়ে উঠতে পারত। ফরাসী নাট্যকার রাসিনের 'ইফিগেনিয়া' নাটকের অনুসরণে লেখা 'সরোজিনী' আলোচনায় এর ট্র্যাজেডি হওয়ার সেই সম্ভাবনা এবং তা না হয়ে ওঁর বিশ্লেষণ গ্রন্থন নাটকখানির স্বরূপ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। অন্যান্য নাট্যকার সেক্সপীরীয় আদর্শ অনুসরণ করেছেন। অবশ্য এই কথা স্বীকার করতে হয় যেমনবন্ধু ও গিরীশচন্দ্র সেক্সপীরীয় নাটকের আকারটুকু নিয়েছেন, প্রতিভা নয়। এ বলে তাঁরা সফল হলেন না। কোনো সন্দেহ নেই যে এইদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থকতা অনেক বেশী। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা হয়েছে যে সেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির নায়কের মৃত্যু কাহিনীর অনিবার্য পরিণাম। দ্বিজেন্দ্রলালের নায়ক বেঁচে থাকে থেকে যন্ত্রণাভোগ করেছেন। যন্ত্রণাভোগের ঐ স্বরূপ মূলতঃ ট্র্যাজিক। রবীন্দ্রনাথেও তাই।

রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রানী"কে আমরা একমাত্র ট্র্যাজেডি বলে গ্রহণ করেছি। "রাজা ও রানী" আলোচনা প্রসঙ্গে "তপতী" নাটকের সাধ্যমত আলোচনা স্বাভাবিক কারণে করতে হয়েছে। "বিসর্জন" ও "মালিনী" নাটকে এসে লক্ষ্য করি কবির দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত হয়েছে। বেদনার ভিতর দিয়ে ইষ্ট উত্তরণ ঘটে যাচ্ছে বেদনার উত্তরণ ঘটে যাচ্ছে - যদিও আঙ্গিকে যথাক্রমে সেক্সপীরীয় এবং গ্রীকরীতির

অনুসরণ রয়েছে। নাটক দুটিকে ট্র্যাজেডি বলতে কুণ্ঠিত হয়েছি। যে মনোভঙ্গীর জন্যে "বিসর্জন" ও "মালিনী" ট্র্যাজেডি নয় সেই কারণে "যুক্তধারা" ট্র্যাজেডি নয় বলেই তৎসম্পর্কে পৃথক আলোচনা না করে উপসংহারে সাধারণ মন্তব্য করেছি। আরো লক্ষনীয় হল কবিগুরুর ঐতিহ্য-উত্তীর্ণ নাটকগুলোর সঙ্গে ব্রেখ্ট্-ব্রেখ্টিয়ান ভারতীয় ক্লাসিক নাটকের ভাবগত যোগ। নাটকের বিষয়বস্তু আধুনিক, আঙ্গিক আধুনিক, ভাবদৃষ্টি ভারতীয় ক্লাসিক নাটকের অনুরূপ। সুমেধসশ্রী দুঃখ-তৃষ্ণা এড়াতে যুক্তির বাণী বহন করে, নায়কের ঘটে যাচ্ছে রূপান্তর, তিনি যুক্তি লাভ করছেন প্রবৃত্তির সংকীর্ণতা থেকে। অথচ নন্দ করি নায়ক শেক্সপীরীয় নায়কের মতো অসাধারণ। আমরা মনে করি যে সমস্যা নিয়ে নাটকগুলো গড়ে উঠেছে তার গভীরতা উপলব্ধিগোচর করাবার জন্যে অসাধারণ চরিত্র কল্পিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পর ট্র্যাজেডি নাটকের সন্ধান মেলে না। এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

।। ৩ ।।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-এর "আলমগীর" এবং যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর "খনা" নাটক দুটির ট্র্যাজেডি হিসেবে স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে, তথাপি, বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। কেননা, শুধুমাত্র নাটক বিশ্লেষণ নয়, ট্র্যাজেডি তত্ত্বের প্রয়োগ ও বিবর্তনই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমাদের বিবেচনায় বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত যে ট্র্যাজেডি-ভাবনার অনুবর্তন ঘটেছে ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং যোগেশচন্দ্রের উল্লিখিত নাটক দুটিতে তারই অনুসরণ লক্ষ্য করি। উক্ত নাট্যকারদ্বয়, আমাদের বিনীত ধারণা, ট্র্যাজেডির রূপরীতি প্রয়োগে দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বিজেন্দ্র-অনুসারী। তাই ঐ নাটক দুটির পৃথক আলোচনা পুনরুক্তি ও বাহুল্যবোধে পরিত্যক্ত হয়েছে।

পৌরাণিক নাটকের ভাববস্তু ট্র্যাজেডির পরিপন্থী বলে আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পৌরাণিক নাটকের মূলসুর হল ভক্তি। কোনো কোনো নাটকে দুঃখের ভাব আছে, কিন্তু পরিণামে তা অন্তর্হীন নয়, নিরুপশম নয়। আঙ্গনে এই সকল

নাটকে যা লক্ষ করি তা হল এই যে, নাটকগুলোতে ট্র্যাজেডির উপাদান উপকরণ রয়েছে কিন্তু লেখকদের দৃষ্টিকোণ ও পাকৌশল ভিন্নতর। ফলে ট্র্যাজেডির আমেজ লাগলেও ট্র্যাজেডি হয়নি। এই প্রসঙ্গে "জনা" এবং "নরনারায়ণ" নাটক দুটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বিষয়টা সমান্য বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

"জনা" নাটকের শুরুতেই দেখি যে দেববৈশ্যানর নীলধ্বজের ঘরে ভক্তিতে বাঁধা আছেন। তিনি রাজ-পরিবারের সকলকে যাঁর যাঁর মনোমত বর দিয়েছেন। রাজা নীলধ্বজ চেয়েছেন বংশধারী কৃষ্ণের সর্বস্ব দর্শন, জনা চেয়েছেন পতিভক্তি এবং অর্জুনে পাণ্ডু 'ত্যজি প্রাণবায়ু"। প্রবীর চেয়েছেন ভুবনবিজয়ী বীরকে বীরকে প্রতিযোদ্ধারূপে, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে অসৌর্য পরিতৃপ্ত করতে। সুধা চেয়েছেন পতিভক্তি। প্রজাসাধারণের বাসনা পূরণ করবেন "নরবপু ধরি কৈতাবর" স্বয়ং, এহেন আশ্বাস দিয়ে অগ্নিদেব বলেছেন, "আমিও পরিত্রহব নেহারি শ্রীহরি।" আরো লক্ষণীয় হল প্রথমেই বিদূষক সিংদাগুনে ভক্তির পূর্ণ তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন এবং বিদূষকের কথায় কৃষ্ণলীলার ছায়া এসে পড়েছে। অগ্নিদেব হরিগায়ে "মুক্তি পায় মরে" বলে নাম মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন। এইভাবে ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে ভক্তি-ময় পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন নাট্যকার। ২য় গর্ভাঙ্কে অগ্নিদত্ত বর কিভাবে ফলপ্রসূ হল তাই দেখানো হয়েছে। প্রবীর পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে বন্দী করেছেন, অর্জুন তার রক্ষক। জনলের ঘরে প্রবীর সমরসজ্জা মেটাবার উপযুক্ত প্রতিযোদ্ধা পেলেন। ৩য় গর্ভাঙ্কে প্রবীরের মাতৃভক্তি এবং অর্জুনের কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ, ৪র্থ গর্ভাঙ্কে নানা বাদবিতণ্ডার ভিতর দিয়ে কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হয়েছে। বিদূষকের উক্তিগুলোতে তার প্রমাণ মিলবে। আবার ৫ম গর্ভাঙ্কে দেখি যে, মহাদেব কৃষ্ণনামে বিভোর। এই গর্ভাঙ্কে জানা গেল যে, প্রবীর উপাসনা করে জনা মহাদেবের কিংকরকে পুত্ররূপে পেয়েছেন। প্রবীরের মানবলীলা সংবরণ করে কৈলাসে প্রত্যাবর্তনের সময় উপস্থিত। কাজেই নাটকীয় ঘটনা তদভিমুখী হবে এমনটাই অভিপ্রেত - প্রকৃতপক্ষে হয়েছে তাই। আমরা বাস্তবজীবনের ভিতরে থেকেও বাস্তবাতীত

জগতের ইশারা পাই । মহাদেবের নারায়ণ বন্দনা, নারায়ণের শিবস্তুতি, জনার ××× আহ্বানী অর্চনা, নীলধ্বজ, বিদূষক, অশ্বির হরিভক্তি সব কিছু মিলে আমাদের মধ্যে ভক্তির উদ্দীপন ঘটায় । নারায়ণী লীলা অতীন্দ্রিয় স্তরে চেতনাকে সদাজাগ্রত করে রাখে । ঐ লীলামাহাত্ম্যের উপলব্ধিতে জাগতিক সুখদুঃখবোধ কেমন যেন ফিকে হয়ে পড়ে । হরিনামে মানুষ মুক্তি পায় এমন কথা কখনো প্রত্যক্ষভাবে, পরোক্ষভাবে কখনো বা ঘুরেফিরে ধুয়ার মতো এসেছে । মুক্তি অর্থ জীবনের সুখদুঃখের পরপারে চলে যাওয়া, জীবধর্মের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া । এহেন অবস্থায় ব্যবহারিক জীবনের সুখদুঃখের প্রশ্নটাই গৌরব হয়ে পড়ে । বিদূষকের উক্তি এই এই রকম, - "যে নামের তাঁর নামে ××× আসে, দয়াময় হরি তার নাকে আসে আসা বসে ।" ভক্তির পরীক্ষা এমন কঠিন ভাবেই হয়ে থাকে । ঐহিক বাসনার ক্ষয় হওয়ার পরে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি । মৃত্যুঞ্জয় বেদনার পথেই বটে । এখানে আশা হল মুক্তি, সাধনা হল দুঃখ । দুঃখের কাঁটা মাড়িয়ে চিরানন্দলোকে পৌঁছতে হয় । কেদারবদ্রী তীর্থযাত্রীর নয়, কিন্তু ছড়াই - উৎরাই ভাঙবার কষ্ট স্বীকার করেই সেখানে পৌঁছতে হয় । "জনা" নাটকে দেখি ইপ্সিত বস্তু পাওয়ার বা বলা যেতে পারে যে যার মনোমত লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে যা কিছু যন্ত্রণাভোগ করেছেন । এই কথা তো মানতেই হবে যে, পথে বেরুলে হোঁচট খেতেই হবে, পথের দুঃখবরণ করতেই হবে , উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার পরে পথের দুঃখকষ্ট আর দুঃখ বলে বোধ হয় না । এই নাটকে জ্বালা - যন্ত্রণাভোগ অবিমিশ্র নয় । পরিণামে সান্ত্বনা আছে ।

আবার এটাও লক্ষণীয় যে, নাটকে দুঃখকষ্টের যে জাল বোনা হয়েছে তা মানবীয় ভ্রান্তিজাত নয় । নায়িকার অদৃষ্ট থেকে উৎসারিত নয় কোনো অবশ । তার পরিবেশের অটিয়াঙ্গিও নেই । আগাগোড়া ঘটনা দেবলীলার অন্তর্গত । অন্তত সাধারণ অর্থে দৈবী মহিমার প্রকাশক । অশ্বির বরদান, মহাদেবের উক্তিতে, কৃষ্ণের ××× কার্যকলাপে, বিদূষকের আচরণে তার ইঙ্গিত রয়েছে । নিয়তির কোনো দুর্জ্ঞেয় লীলা অনুভূত হয় না । সব কিছুই যেন পূর্বনির্ধারিত ।

জনার জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা মানবিক রূপেই এঁকেছেন নাট্যকার । তবুও তাঁর বেদনা আমাদের মধ্যে ট্রাজিক অনুভব সঞ্চারিত করে না । প্রবীরের মৃত্যু, জনার আহ্বানীর জলে আত্মবিসর্জনের হেতুরূপে অপরিহার্য, অতবড় আঘাত না পেলে তাঁর

আত্মবিসর্জনের অবকাশ আসত না। কৃষ্ণ সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছেন। নীলধ্বজ সাক্ষাৎ নারায়ণের দর্শনে পুত্রশোক ভুলেছেন। বুঝেছেন সবই অনিত্য। আত্মা ও জন্ম শেষ পর্যন্ত কৈলাসে স্থান পেলেন, সব জ্বালা-যন্ত্রণা তখন নির্বাপিত --

"জন্ম প্রসূন বদনা
চামর দুলায় পাশে
নহে আর পুত্রশোকে উন্মাদিনী
প্রশস্ত বুঝিয়ে তুপ্ত মন কর স্থির।"

এই বোধ সঞ্চারিত করলেন নাট্যকার। জাগতিক সুখদুঃখের অস্তিত্ব যেন বাতিল হয়ে যায়। দুঃখ আর দুঃসহ হয়ে ওঠে না। কোনো দুঃখ অযৌক্তিক বা অসঙ্গত নয়। জ্ঞান বা ভক্তির দৃষ্টিতে দেখলে সুখ দুঃখ বলে কিছু নেই। আমরা সুখে উল্লসিত হই, দুঃখে কাঁদি এসবই ত্রিবর্গের বশে। মায়াবন্ধ বলে। কৃষ্ণের শরণাগত হলে অজ্ঞানতা কেটে যাবে। তখন জাগতিক সুখদুঃখবোধের স্বরূপ যায় বদলে, অখণ্ড আনন্দলোকে ঘটে উত্তরণ। এই বোধে উত্তীর্ণ করেছেন নাট্যকার। স্থূলভাবে দেখানো হয়েছে জীবনের দুঃখদহনের পরে সুখলাভ। ট্রাজেডির নায়ক বা নায়িকার জন্মে সুখবাসের প্রতিশ্রুতির কথাই জানাই বাহুল্য। [১] "জন্মা" নাটকের সমগ্র কাহিনীর মূলে বর্ণিত ভক্তিবাদ - মায়ামোহমুক্তি।

"নরনারায়ণ" নাটকটিও ভক্তিমূলক। নাটকের নায়ক কর্ণ। এই কর্ণ ছাড়া নাটকের অন্যান্য পাত্র পাত্রী সকলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বায় বিশ্বাসী। কর্ণ সাহিংস নাস্তিক ও মূল মনে অহংবাদী। কিন্তু "নরদেহে বিষ্ণু নারায়ণ" আর তিনি "দেহরক্ষী ধর্মবীর" স্বীকার করতে তাঁর বাধে। এই সংশয় নিয়েই নাটকের সূত্রপাত। প্রথমেই নাস্তিকবাদী কর্ণ মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, "যথা ব্রহ্ম সূতপুত্র আমি।" অপরপক্ষে ব্রাহ্মণের অভিশাপ এবং পরশুরামের সর্তসাপেক্ষ অভিশাপ এই দোটানার মধ্যে তিনি দুলছেন। তিনি সূতপুত্র এই বিশ্বাসের উপর ভর করে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর নিজের জ্ঞান - বিশ্বাসে তিনি অজেয়, দেবেরও অবধ্য। এরপরেও যদি অর্জুনের বাণে তিনি নিহত হন তবে তাহলে দৈবলীলাকে স্বীকার করে নিতে হয়। স্বীকার করে নিতে হয় নরদেহধারী

নারায়ণ "দেবকীর গর্ভে গাণ্ডীবীর" । অর্জুনকে যুদ্ধে জয় করবার ঐকান্তিক আগ্রহের মূলে কর্ণের আত্মপ্রতিষ্ঠা, যশোলিপ্সা নয়, - কৃষ্ণের ভগবত্তার নিঃসংশয় প্রমাণ নেওয়ার আগ্রহ অধিক । এই কারণে দুর্যোধনকে ভারতযুদ্ধে উৎসাহিত করেছেন । ভারতযুদ্ধে তার মনে অর্জুনের দ্বৈরথযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী । এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের ভিতর দিয়ে কৃষ্ণের ভগবত্তার পরীক্ষা হয়ে যাবে । নরের অবধ্য, দেবের অবধ্য, "আত্মা - মনুষ্য - নারায়ণ" - এর অবধ্য কর্ণ পরাজিত হলে -

"যদি মরি অর্জুনের বাণে - যদি - যদি
মরি। তবে সেই মৃত্যুযুদ্ধে বাসুদেব,
তোমারে বলিব নারায়ণ ।"

(৯ম অঃ ক, ৩য় দৃশ্য)

কৃষ্ণ দৌত্যকর্মে আসছেন জেনে কর্ণ দুর্যোধনকে পরামর্শ দিলেন কৃষ্ণকে বন্দী করতে । কৃষ্ণ যদি গীতাই ভগবান হন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্ ইতি ব্রহ্ম" যদি দেহধারণ করে থাকেন তাহলে দুর্যোধনের পক্ষে তাঁকে বন্দী করা কখনোই সম্ভব হবে না । ঐশী শক্তির বলে কৃষ্ণ আত্মরূপ করবেন । তার ভিতর দিয়ে কৃষ্ণের নারায়ণত্ব যাচাই হয়ে যাবে ।

আরো লক্ষণীয় হল যে, ~~সজ্ঞানে~~ অজ্ঞানে, আগ্রহ চেতনায় কর্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণের ভগবত্তা স্বীকার করেন না । মনশ্চক্ষুতা বাধা হয়ে দাঁড়ায় । অথচ চৈতন্যলোকে প্রবেশের প্রস্তুতিতে কৃষ্ণের ভগবত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত । মৃত্যুশয্যায়, মৃত্যুচিন্তে মনশ্চক্ষুতা যখন অবশ, তখন দেখেন -

"ওকি ও সুন্দর ওকি মধু রূপরেখা
ওকি বর্ণ নবীন নীরদ । ওকি মুখ আঁখি -
অমৃত - মধুর । বাসুদেব - বাসুদেব -
এমন - কিশোর - তুমি ।"

আবার দুঃশাসনের -

"ঘৃণার - উত্তর স্পর্শে
কলুষিত তোমার তনু - হে কর্ণের
এই কোমল তুমি । তোমারে বাঁধিবে ।
কে বাঁধিবে ? কে বেঁধেছে - কবে ? সেকি ওই -
অন্তরার গ্রন্থি হতে কর্ণের, অথবা কর -
বন্ধুত্বমূর্খ দুর্যোধন ?"

(১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

তাহলে আমরা দেখি করি যে, একদিকে অনুভূতি এবং অন্যদিকে মনন এই দুয়ের দ্বন্দ্বে নায়ক চঞ্চল । অনুভবে যা আসে বুদ্ধির বুদ্ধি তাকে বাধিত করে দেয় । আবার বুদ্ধির পাহারা একটু শিথিল হলে অনুভব প্রবল হয়ে ওঠে । এই দুয়ের লুকোচুরি খেলায় কর্ণ বিব্রত ।

কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব নিয়ে তাঁর যে সংশয় ছিল তার সমাধান ঘটেছে নানা ঘটনার আবর্তন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে । লক্ষ্য করি তাঁর অন্তর্গত বুদ্ধির বিদ্যুৎ বিচলিত হয়েছে কৃষ্ণের দ্বিভুজ বিশ্বরূপ প্রদর্শনের অব্যবহিত পরে, অনুমান করি কৃষ্ণের অলৌকিক কার্যকলাপ দর্শনে । এইটে স্পষ্ট বুঝি যখন দেখি তাঁর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি স্বগতোক্তি করছেন, - আবেগময় নাটকীয় মুহূর্তে কর্ণের উক্তি, -

"শর্বরীযোগে কালে যেমনি করিতে যাই
ইষ্টদেবে স্মরণ, অমনি কেমন ক'রে
তোমার কেশব আসি অন্তরমুখে দাঁড়ায় ।
নবীন নীরদ শ্যাম সেই আবরণে,
ইষ্ট দিবাকর পড়ে যেন দূরে দূরে -
সুদূর পশ্চাতে ।"

(৩য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

আবার শেষদৃশ্যে কর্ণ কৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করে নিলেন তখনকার উক্তি, -

"ভগবান হয় ভগবান ।
কিন্তু ভাই, ভগবান ইচ্ছা যদি করে(ঝরে হস্তদান)
এই মত - প্রাণাধিক, ঠিক এই মত
বৃষ্টি করে । এই মত নবীন নীরদ বর্ণ
এই মত চিরচঞ্চলতা মাঝে স্থির
নীরত্ন আয়ত দুটি আঁখি - "

(৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

লক্ষণীয় কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় "নবীন নীরদ বর্ণ" "আয়ত আঁখি" "এখন কিশোর" শব্দগুচ্ছ বার বার ব্যবহৃত হচ্ছে - এই বাক্ প্রতিমা কৃষ্ণের মধুর রূপের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে, এবং তা পুরোপুরি বৈষ্ণবীয় । "কিশোর" চির নবীনতার ব্যঞ্জনা আনে । আবার "ঝরে হস্তদান" গভীর প্রীতি ও সখ্যের নিদর্শন । এমন মধুরভাবে আরাধনা বৈষ্ণব ভক্তি-বাদের অন্যতম কথা । কৃষ্ণলীলার মাধুর্য আস্বাদনে তা ধন্য । ঐ শব্দ গুচ্ছের পৌনঃপুনিক ব্যবহার ভক্তির পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে ।

আর এই শেষ দৃশ্যে কর্ণ নিজেকে কৃষ্ণের হাতে যখন একেবারে সঁপে দিলেন তখনকার উক্তি -

"হৃষীকেশ । এতদিন প্রাণ - বুদ্ধি - মন
অধিকারে, যা' করেছি, যা' বলেছি, যাহা
কিছু করেছি স্মরণ সমস্ত, সমস্ত --
আমার অস্তিত্ব ল'য়ে আমাকে তোমার
করে দিলাম সঁপিয়া ।"

এখানে "হৃষীকেশ" সম্বোধন খুবই অর্থপূর্ণ । নাটকে শব্দটি কর্ণের মুখে এই প্রথম শুনলাম । "হৃষীক" শব্দটির অর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয় । "হৃষীকেশ" হলেন তার কর্তা তথা ঈশ্বর, যেহেতু তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ~~নিয়ন্ত্রক~~ পরিচালক । তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এতদিন অহংবোধে কর্ণ যা কিছু করেছেন সেই সবেরই প্রেরণা কৃষ্ণ । অহংকে তাঁর কাছে এখন ~~সঁপে~~ সঁপে দিয়ে আদাত্মীকরণে নিঃশ্রেয়স । আবার "সমস্ত" কথাটি তিনবার আবৃত্ত হয়েছে এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তি শেষে পংক্তি থেকে গড়িয়ে এসে চতুর্থ পংক্তির "আমার সমস্ত" কথাটি

[illegible] কথার উপর ঝোঁক পড়েছে। কর্ণের অহংকে পরিপূর্ণভাবে রূপে তোলার ঐকান্তিকতাকে, আন্তরিকতাকে ব্যঞ্জিত করছে। অভি-বাদের মূল কথাই হল পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। অহং-এর বিলুপ্তিতে ট্রাজেডি হয় না।

আসলে যা লক্ষ্য করি তা হল এই যে কর্ণের আত্মবিড়ম্বনায় "life's little ironies" প্রদর্শিত হয়েছে। ক্রুদ্ধ অভিশপ্ত, দুঃখী আলিপ্ত কর্ণ জীবনে বহু জ্বালাময় ঈর্ষা ভোগের পরে উপলব্ধি করেছেন প্রশান্তি। ব্যর্থতা, মৃত্যু সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেনি। মৃত্যুর মহাশূন্যতা পূর্ণ করে রেখেছে উদ্ভাসিত মহাবিলয়ের সুর। এই ধরণের নাটক সম্পর্কে বলা যেতে পারে জীবনের পূর্ণ মূল্য না দিয়েও ট্রাজেডি নাটকের মতো প্রগাঢ় ভাব ও মহিমায় অনুলিপ্ত। [১০]

॥ ৪ ॥

পরিশেষে বক্তব্য হল এই যে, বাংলা ট্রাজেডি নাটকের প্রেরণা হল বৈদেশিক - সেক্সপীয়ার যেন আদর্শ। তাই বিচার-বিশ্লেষণে বিদেশী শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসন শিরোধার্য করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বিষয়বস্তুর অনুরোধে গ্রীক এবং সেক্সপীরীয় ট্রাজেডির রূপরীতি ও অনুবেদনার পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে এবং শিল্পশাস্ত্রের পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আরেকটা কথা - সমালোচকেরা অনেকেই কোনো কোনো বাংলা ট্রাজেডি নাটকে গ্রীক নাটকের আদল এবং অনুবেদনার ঐক্য লক্ষ্য করেছেন, তাতেই বিষয়টির পুনর্বিচারের প্রয়োজন বোধ থেকে গ্রীক ট্রাজেডির রূপরীতি ও আবেদনের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বিচার-বিশ্লেষণে আমরা কেবল নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা পাঠ করেছি। কোনো দার্শনিক বিচার আমাদের অভিপ্রায় নয়। অবশ্য সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ থাকলেও তল অচল ভেদ নেই, তাই মাঝে মধ্যে দর্শনের কথা এসে পড়েছে কিন্তু গৌণভাবে, সাধারণ অর্থে। সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক যেমনই হোক

না কেন তবুও সাহিত্য সাহিত্য ই । তাই আমাদের ধারণা শিল্পকে শিল্পতত্ত্বের দিক থেকে দেখাই সঙ্গত, দার্শনিক xxxxxx তত্ত্বের ছাঁচে ফেলে দেখতে গেলে সাহিত্যকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ত্রুটি থেকে যেতে পারে, ফলে মানসিক বোধ তৃপ্ত নাও হতে পারে ।

এই গ্রন্থে পাদটীকা ব্যবহার না করে প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে উল্লেখপঞ্জীতে প্রাসঙ্গিক বিষয় বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হয়েছে । যথাসাধ্য সংশোধন করবার পরেও গ্রন্থে ভুলভ্রান্তি নেই এমন কথা হলপ করে বলতে পারি না । তাই কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি চোখে পড়া অসম্ভব নয় । ভ্রান্তি মূলতঃ বানান, বানানের রীতি, যতিচিহ্ন স্থাপন এবং অক্ষরপাতের যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত । 'প্রথিকৃৎ ন দোষায়' বিবেচনায় এই সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হল ।

গ্রন্থের যেখানে টাইপ হয়েছে "আকাঙা, কাঙিত, কাঙা, উচ্চাকাঙা, শৃংখল, বিশৃংখল, অংক, গর্জাংক, অলংক, সংকা, নিঃশংক, আশংকা, সংক্তি, অদ্ভুত্ব" সেখানে হবে "আকাঙ্ক্ষা, কাঙ্ক্ষিত, কাঙ্ক্ষা, নিঃশঙ্ক, আশঙ্কা, সঙ্কিত, অদ্ভুত্ব" । 'আপোস' হবে 'আপস' । 'আশাত:, আপাতত:, বানানে : বাদ যাবে এবং আপাত: যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানেও ':' বাদ দিয়ে পড়তে হবে । কিন্তু 'বিশেষত, মূলত:' বানান হবে বিশেষত:, মূলত: । 'জন্যে, এইজন্যে' পড়তে হবে 'জন্য, এইজন্য' ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানের যে সরলরীতি স্থির করে দিয়েছেন গ্রন্থে তাই অনুসরণ করা হয়েছে । রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জনা পরিত্যাজ্য । অর্থাৎ 'পরিবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, আর্ত্ত ইত্যাদি হবে 'পরিবর্তন, বিবর্তন, আর্ত' । তেমনি 'কার্য্য, কার্য্যে, সূর্য্য, লক্ষ্য হবে কার্য, কার্যে, সূর্য, লক্ষ্য' । যদিচ 'লক্ষ্য' এবং 'লক্ষ্য' বানান বিভ্রান্তিকর(সমার্থক এবং ~~কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম কৃত নিয়মে~~ প্রেক্ষিতে অপরিহার্য রীতিতে) গ্রন্থে তবুও আমরা বানান রীতির মান্য রক্ষার্থে 'লক্ষ' ব্যবহার করেছি । 'সৃষ্টি রাখা' অর্থে শব্দটির ব্যবহার বুদ্ধদেব বসু করেছেন এবং 'ভলন্টিয়ার' ও তার সমর্থন রয়েছে ।

কোনো ক্ষেত্রে একটি অক্ষর আর একটি অক্ষরের রূপে লেপ্টে গেছে(এক, একর, এর এবং) আ-কার, ই-কার, এ কার, ফলা -চিহ্ন একটার রূপে আর একটা ছড়িয়ে গেছে, আবার কখনো এর মাথায় মাত্রা পড়ে গেছে (ঈর্ষা ঈর্ষা, ঈদৃশ, ঐকে) ছাড়া অক্ষরপাতের যান্ত্রিক অসুবিধার জন্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্ঞাতা, লাঞ্ছনা টাইপ হয়েছে জ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্ঞাতা, লাঞ্ছনা । উপর্যুক্ত ভুলভ্রান্তিগুলো গুরুতর সত্ত্বেও এড়ানো যায়নি এবং তা অজ্ঞানতা জনিত না বলে প্রসন্নভূতি দিয়ে বিচার করলে কৃতজ্ঞ থাকব ।

।। গ্রন্থপঞ্জী ।।

১। Steiner George : The Death of Tragedy : Faber & Faber, paperback, 1974 : P.4. .."The ways of God to man are just. Not only are they just, they are rational."

২। Leech Cliffered : Shakespeare's Tragedies : Chatto and Windus,1961 : P.10. "..... We are assured in an epilogue that the hero and his supporters will find their way to the Elysian fields while their adversaries will know internal tortures, but in Othello and Lear and Macbeth there is no such emphasis on a compensatiry future life."

৩। Dasgupta Dr.S.N. & De Dr. S.K. : A history of Sanskrit literature, Vol.I, 2nd edition, C.U. 1962 : P.XLVII. "The general optimism of Indian thought and philosophy that the world process ultimately tends to beatitude and happiness whatsoever pains and suffarings there may be in the way that Indian Drama as a rule does not end tragically."

_____ Wells Henry W. : The Classical drama of India : Asia publishing House : 1963, P. 43. ...."it is a celebration of comic poise a highly formal and unmistakably aesthetic projection of life idealistically conceived."

৪। দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায় ঃ শীর্ষক আলোচনা ।

৫। দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায় : ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক'র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে ।

৬। Steiner George : The Death of Tragedy : Faber & Faber : paperback,1974 : P.342-44.
The marxist world view, even explicitly than the Christian admists of error, anguish, and temporary defeat, but not of ultimatelty tragedy. Despair is a mortal sin against Marxism no less than against Christ. ..... The tragic theatre is an expression of the pre-rational phase in history, it is founded on the assumption that there are in nature and in the psyche occult., uncontrollable forces able to madden or destroy the mind. The Marxist knows that such forces have no real existence they are metaphers of ancient ignorence or phantasms with which to frighten children in

in the dark. He knows that there is no such thing as Anangke the blind necessity which in the dark overwhelms Oedipus. "Necessity is blind," said Marx and Engels "Only where it is not understood". Tragedy can occur only where reality has not been harnessed by reason and social consciousness. ..... Moreover, the Marxist creed is immensely, perhaps, naïvely optimistic. Like the medieval visionary with his absolute faith in the advent of the kingdom of God, the communist is certain that the kingdom of justice nearing on earth. The Marxist conception of history is a secular commedia. Mankind is advancing toward the justice, equality, and leisure of the classless society When capitialist exploitation shall have ended and the state withered away, war and poverty will vanish into a nightmare of dim remembrance, and the world will once again be a garden for man, ... There can be detours of heresy and schism within the socialist camp. But even the grimmest setback gives no ground for tragic despair. The march forward continues for it has behind it the inexorable laws of history; final victory is as certain as the coming of dawn.

..... This axiom of necessary joy was made explicit in the title of a play produced in 1934 Vishnievsky's 'The Optimistic Tragedy'. It dramatizes the heroic death in battle of a company of Red marines. All perish before our eyes, but we are not meant to regard their sacrifice as tragic, for it contributes to the final victory of the party and the Soviet Union. Together with the devout Christian, the communist can ask : "Death, where is thy sting ?"

9| Ibid : P. 8. "Tragedy is irreparable, It cannot lead to just material compensation for past suffering."
Richards I.A. : Principles literary criticism, Routledge and Kegan Paul, paperback, 1970, pp. 193-94. "The mind does not shy way from anything it does not protect itself with any illusion, it stands unconforted, alone and self reliant. .... The least touch of any theology which has a compensating Heaven to offer the tragic hero is fatal."

29053

৮। দুঃখবাদ প্রসঙ্গে দ্রঃ ঐ শীর্ষক আলোচনা। কাব্যবিশ্লেষণাত্মক আলোচনার এবং ট্রাজেডির তত্ত্বও সেখানে আলোচিত হয়েছে।

৯। Richards I.A. Principles of Literary Criticism : Routledge & Kegan Paul(Paperback),1970,pp. 193-94.

১০। Steiner George : The Death of Tragedy : Faber & Faber, (Paperback),1961 : P.133. "It represents the desire of the reactions to enjoy the privileges of grandeur and intense feeling associated with tragic drama without paying the full price."